মাদাম কুরী

কৃষ্ণা রায়

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

প্রাক্-কথা

এ যুগে কোথাও কোনো আলো
কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সমুখে নেই যাত্রিকের ;
(জীবনানন্দ দাশ, ১৯৪৬-৪৭)

আলোক-প্রাপ্ত সমাজ কাকে বলে? যেখানে সমাজের সব স্তরের মানুষের সার্বিক অধিকার স্বীকৃত? না কী সেই সমাজ, যেখানে আগুনের আঁচে ছারখার হয়ে যায় জীবনের সব নির্যাস? '

এ মুহূর্তে, আমাদের দেশের পরিবারগুলি যেসব গভীরতম অসুখে আক্রান্ত, তাদের মধ্যে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে স্ত্রী ও কন্যা-সন্তানের ওপর 'শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন' নামক মনোবিকারটি, এবং অবশ্যই কন্যা ভ্রূণ-হত্যা; নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য তথা স্ব-নির্ভরতা আজও এদেশে নিতান্তই এক অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা। এ বিষয়ে নারী না পুরুষ — কার ভূমিকা করুণ, কারই বা বর্বরের, সে নিয়ে আলোচনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। আসলে, এই

'সংশয়-তিমিরে' ঘেরা ক্রান্তিলগ্নে মহৎ কোনো প্রেরণা মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্য নিজের ভেতরে অসম্ভব তাগিদ অনুভব করছিলাম। আমি সেই অর্থে সমাজ-সেবী নই, আমার পেশা অধ্যাপনা। এই সুবাদে, সম্ভাবনাপূর্ণ বহু মেয়েকে বাধ্যতামূলক নিষ্ফল জীবন-যাপন করতে দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এ দেখায় বড়ো কষ্ট পেয়েছি। তাই, খুঁজে নিতে ইচ্ছে করছিল—এমন এক নারীকে, যিনি জীবনে অজস্র প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নিজেই, নিজেকে আলো দেখিয়েছিলেন, নিজেকে সারা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ করে তুলেছিলেন; যাঁর আত্মবিশ্বাসী লড়াকু মানসিকতা আজও পরাজিত-প্রায় মানুষকে প্রেরণা জোগায়। 'তেজস্ক্রিয়তা'র অন্যতম আবিষ্কারক, রেডিয়ামের আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর জীবনীটি পড়েছিলাম ছাত্রীজীবনে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ইভ কুরীর লেখা মাদাম-কুরীর জীবনীগ্রন্থটি আমায় পুরস্কার দিয়েছিলেন বেলতলা-গার্লস-হাই-স্কুলের শিক্ষিকা প্রয়াতা সুধা রায়। ছেলেবেলায় কোনো গ্রন্থ পাঠ , আর পরিণত বয়সে সেই একই গ্রন্থ পাঠে নিজের অনুভূতির ফারাক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা যায়। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম — এই জীবনীটি পাঠ করে আমার পুরোনো ভালোলাগা-বিস্ময়-শ্রদ্ধা একই রকম নেই, অনুভূতির প্রখরতায় আমি আরও বহুগুণ আলোড়িত হচ্ছি। তাঁর সম্পর্কে আরও বই, গবেষণা-পত্র সংগ্রহ করে পড়লাম আর একটি মানুষকে সার্বিকভাবে কল্পনায় স্পর্শ করার আনন্দে রোমাঞ্চিত হলাম। তাঁর জীবনী পড়তে পড়তে কখনও তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছি, যখন দেখেছি তাঁর মতো অসামান্যাকেও দুশ্চরিত্রা, ডাইনি বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে ; পুরুষ-তন্ত্রের আগ্রাসনে কতবার তাঁর প্রতিভাকে খাটো করে দেখা হয়েছে। কিন্তু এই নারী, আজীবন উটের মতো কাঁটা গাছ খেয়ে রক্ত ঝরিয়েও পরাজয়কে স্বীকার করতে চাননি। তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া মানুষের অজস্র অপমানকে নস্যাৎ করে

বারে বারে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন; চোরা বালির মধ্যেও শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে আমৃত্যু মানুষের সেবায় বিজ্ঞানের গবেষণায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। — কী ল্যাবরেটরিতে, কী রণক্ষেত্রে তাঁকে যত জেনেছি, তত বিহ্বল হয়ে পড়েছি, একশো-চল্লিশ বছর বয়সিনী অদেখা এক বিদেশিনীর জন্য ভীষণ গর্ব হয়েছে। উনিশ শতকের অজস্র নারীর মতো স্ত্রী-কন্যা-জননী-গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা যথাযথ পালন করেও নিজেকে কী ভীষণ ব্যাপ্তিতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অসম্ভব শৃঙ্খলাপরায়ণ এই নারী আজীবন বিশ্বাস করে এসেছেন, 'নাথিং ইন লাইফ ইস ট্যু বি ফিয়ার্ড। ইট ইস অনলি ট্যু বি আন্ডারস্টুড'।

এই সাহসিনী মহীয়সীর জীবনী পড়তে পড়তে অনুভব করলাম, কতদিন পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি কাঁদছি। আমার এই অনুভূতির কথা একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলাম। শুনে উনি বললেন, 'তাহলে তোমার ঊর্ধ্বায়ন ঘটছে।' সত্যি সত্যি নিজের মধ্যে কী ঘটেছে বা ঘটবে, তার বিচার নিজে নাই বা করলাম, কিন্তু মাদাম কুরীর এই আলোকিত-জীবন-কথা আজকের দিশাহীন নবীনপ্রজন্মের জীবনে নিশ্চিত ঊর্ধ্বায়ন ঘটাতে পারে — এই বিশ্বাসে বাঙালি পাঠকের কাছে সহজ-সাধারণ ভাষায় তুলে ধরার মতো সামান্য ধৃষ্টতা দেখালাম।

সর্বকালের এই মহিমাময়ীর জীবন-ভাষ্য লেখার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়ায় আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই 'পুনশ্চ'-এর কর্ণধার শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ককে এবং অবশ্যই আমার কন্যা সোহিনীকে। ধৈর্য সহকারে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে নিষ্ঠুর সমালোচনা করতে যে ছাড়েনি।

ড. কৃষ্ণা রায়
রিডার, শারীরবিদ্যা বিভাগ
সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

প্রাক্-কথা : তৃতীয় সংস্করণ :

মাদাম কুরীর এই ক্ষুদ্র জীবনীটি অজস্র পাঠকের সমাদরের কারণে তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। দু হাজার সতেরো সালে তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষের সময় থেকেই এই দাবিটি লক্ষ্য করা যায়। আসলে এক একটি মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবন-ই দাবি করে দশক দশক জুড়ে পাঠকের আগ্রহ, কৌতূহল। এই জীবনীটি লেখার পর বারো বছর কেটে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে সামান্য কিছু তথ্য সংযোজিত হলেও বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রকাশ এ মুহূর্তে না করলেই নয়। ইতিমধ্যে তাঁকে নিয়ে বহু জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সারা পৃথিবীতে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে দেখেছেন জীবনীকারেরা। বিগত বহু দশক ধরে বন্দি তাঁর গোপন ডায়েরি, চিঠি, ওয়ার্কবুক, পরিবারের মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় মানবী মাদাম কুরীকে আরও নিবিড় ভাবে চেনা যায়। লিঙ্গ ভিত্তিক অসম্মাননা, অপমান মাথায় নিয়েও যে মাথা অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেনি, ইউরোপের সেই প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি ধারিনী, সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী অধ্যাপক, বিভাগীয় গবেষণাগারের প্রধান, দু-দুটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদাম কুরীর জীবনের অজস্র অনালোচিত বিষয়ের জন্য বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকের কাছে বারে বারে ফিরতেই হবে।

ড. কৃষ্ণা রায়
অধ্যক্ষ, বেথুন কলেজ

সূচিপত্র

শৈশব	১৬
কৈশোর	২১
বয়ঃসন্ধি	২৮
প্রথম যৌবন	৩৩
স্বপ্নের দেশে	৩৯
হৃদয়-সখা	৪৪
বিভাসিত সাধনায়	৫২
দুঃখের তিমির মাঝে	৬৬
প্রতিভার মধ্যাহ্নে	৭০
বিশ্বসাথে যোগে যেথায়	৭৮
সুখ-দুঃখের নকশি কাঁথা	৮৪
তব জীবনের আলোকে	৯১
দিন-অবসানে	৯৯
পরিশিষ্ট	১০৪

শৈশব

ফুটফুটে একরত্তি মেয়ে মানিয়া। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো। দাদা জোসেফ আর তিন দিদি জোসিয়া, ব্রনিয়া ও হেলার বড্ড আদরের বোন। তবু মানিয়ার ছোট্ট বুকে কেমন গোপন একটা কষ্ট। মা তাকে তেমন করে আদর করেন কই? সারাদিন মায়ের কত কাজ। জুতো-সেলাই থেকে ঘরের খুঁটি-নাটি কত কী যে মা-কে সামলাতে হয়। শুধু মানিয়া-কে কোলে বসিয়ে আদর করে চুমু খাওয়ার সময় তাঁর হয় না। বেচারা মানিয়া। সে জানেই না, সারাদিন সংসার নিয়ে যে মা এত পরিশ্রম করেন, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে ভয়ংকর এক ছোঁয়াচে রোগ। 'যক্ষ্মা'। তাদের বাড়িতে, ভাই-বোনেদের হুল্লোড় আর দুষ্টুমির ফাঁকে ফাঁকে অন্য এক রকমের শব্দ শোনা যায়। মায়ের শুকনো কাশির শব্দ। আর এই শব্দটা শুনলেই মানিয়ার বাবার মুখটা যন্ত্রণায় গম্ভীর হয়ে ওঠে। রোজকার সান্ধ্য-প্রার্থনায় সব ভাই-বোন তখন একযোগে বলে, মা-কে সারিয়ে দাও ঈশ্বর।

মানিয়ার মা মাদাম শ্ক্লোডোভস্কি সুন্দরী, বিদুষী এবং সুগায়িকা। পোল্যান্ডের গ্রামের এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরের নামি একটি বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হলে

কী হবে, ঘরের কাজ করতেও তাঁর আলস্য ছিল না। ভীষণ পরিশ্রম করে সংসার ও চাকরি নিপুণভাবে সামলাতে পারতেন তিনি। কিন্তু, একসময়, তাঁকে চাকরি ছাড়তে হল। কারণটা আর কিছুই নয়—সাংসারিক প্রয়োজন। মানিয়ার বাবা ভ্লাদিস্লাভ শ্ক্লোডোভস্কি ওয়ারশ'তে একটি সেকেন্ডারি স্কুলের ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন। হঠাৎই তাঁর চাকরিতে পদোন্নতি হল। অন্য একটি স্কুলের অধ্যাপক এবং সহ-পরিচালকের পদে তাঁকে নিয়োগ করা হল। মানিয়ারা এতদিন থাকত মায়ের স্কুল-বাড়িটির দোতলার একটি বাসায়। বাবার নতুন চাকরির জন্য পুরোনো বাসা-বাড়িটি ছেড়ে তারা চলে এল নোভোলিপকি স্ট্রিটের বাসা-বাড়িতে। মানিয়ার মা পড়লেন মুশকিলে। পাঁচটি শিশুসন্তানের দায়দায়িত্ব সামলে দূরের স্কুলে গিয়ে চাকরি করা তাঁর পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সময়টা ১৮৬৮ সাল। মানিয়া তখন নেহাতই কয়েক মাসের শিশু। মানিয়া জন্মেছে ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর, ওয়ারশ শহরে। আর মানিয়ার জন্মের কিছুকাল পর থেকেই মায়ের শরীরে রোগ ধরা পড়েছে। সেকালের দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ।

মানিয়ার বাবার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী। ওয়ারশ শহর থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার উত্তরে শ্ক্লোদিতে তাদের বিরাট খামার-বাড়ি। এজন্যই তাদের উপাধি শ্ক্লোডোভস্কি। এ পরিবারের প্রথম বুদ্ধিজীবী ছিলেন মানিয়ার ঠাকুরদা জোসেফ। মানিয়ার বাবা অধ্যাপক ভ্লাদিস্লাভ, পিট্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন। সংসারের অর্থাভাব, স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধি, কিছুই এই শিক্ষকের প্রাণশক্তি কেড়ে নিতে পারেনি। মানিয়ার জীবন-রেখার মূল কাঠামো তৈরি করেছিলেন তার বাবা ও মা। বাবার তীক্ষ্ণ মেধা ও বিজ্ঞানের প্রতি অদম্য আকর্ষণের পাশাপাশি, মায়ের চরিত্রের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা, রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন অথচ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি, দৈনন্দিন জীবনের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা,

সাংসারিক দায়িত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রভৃতি অজস্র বিষয় মিলে নির্মাণ করেছিল ভবিষ্যতের এক অসাধারণ নারী বিজ্ঞানীকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে, যিনি কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি; বিজ্ঞান-চর্চা করেও কবিতা-নাটক-সংগীত-উদ্যান চর্চা এবং সাংসারিক কাজে শ্রদ্ধা হারাননি সর্বোপরি স্বদেশ-প্রেমেও আমরণ যিনি স্থিতধী ছিলেন।

'মানুস্যিয়া, এবার আমায় ছাড়ো মা,' ছোট্ট মানুস্যিয়ার বাহুডোর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত সাবধানী মা বলে ওঠেন, 'কত কাজ পড়ে। এবার আমি যাই। যাওনা তুমি এখন বাগানে, ওখানে খেলা করো'।

ছোট্ট মানিয়াকে আদর করে কত যে নামে ডাকেন মা। মানুস্যিয়া, আন্সিউপিসিও। মানিয়ার আসল নাম মারিয়া। নেহাতই ছোট্ট এই মেয়েটার বইপত্রের দিকে ভয়ানক আগ্রহ। দাদা-দিদিদের দেখাদেখি সে-ও পড়তে চায়। মেজদি ব্রনিয়ার সবে অক্ষর পরিচয় হয়েছে। সদ্য-শেখা অক্ষর পরিচয়ের বিদ্যে বোনের ওপর প্রয়োগ করে সে। ব্রনিয়া মাস্টারনী, মানিয়া ছাত্রী। দিব্যি চলে তাদের পড়া-পড়া খেলা। আর তাতেই একদিন এক অঘটন ঘটে গেল। বাবা-মায়ের সামনে অক্ষর পরিচয়ের সঠিক পরীক্ষা দিতে পারছিল না ব্রনিয়া। আর চারবছরের মানিয়া অধৈর্য হয়ে বইটি হাতে নিয়ে ঝরঝর করে পড়ে ফেলল বই-এর বেশ কয়েকটি লাইন। মানিয়ার পক্ষে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। মানিয়া প্রতিভাময়ী। কিন্তু মানিয়ার মা-বাবা অন্য ধাতুতে গড়া। সন্তানের এই কৃতিত্বে তাঁরা মোটেই উচ্ছ্বসিত হলেন না। বরং সতর্ক হয়ে পড়লেন। এ শিশু মেধাবী নিশ্চিত। কিন্তু মেধাচর্চার জন্যও জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর ছাড় দেওয়া উচিত। এখন সে বরং পুতুল খেলুক, গান করুক, বাগানে গাছপালা দেখুক।

মানিয়ার দাদা, দিদিরা প্রত্যেকেই এক-একটা বিচ্ছু। বড়দি জোসিয়া অবশ্য ছোটো ভাই-বোনেদের একটু-আধটু শাসন করে থাকে। জোসিয়া চমৎকার গল্প বলতেও জানে। তার গল্প বলার ভঙ্গিটা

বেশ বৈচিত্র্যময়। হাসিতে- অভিনয়ে সেসব গল্প সহজেই শ্রোতার মন ছুঁয়ে যায়। ভাই-বোনেরা তার গল্পের মুগ্ধ শ্রোতা। ছোট্ট মানিয়া খুব ভালোবাসে দিদির গল্প শুনতে। যেমন ভালোবাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে তাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে। সেখানে সব ভাই-বোনেরা একসঙ্গে নদীতে নৌকো চড়ে, গাছে ওঠে। ওহ! কী মজায় না দিনগুলো তখন কেটে যায়। মানিয়ার সবচেয়ে ভালো লাগে যখন আদর করে দাদা-দিদিরা তাকে লেবু গাছের শক্ত ডালে বড়ো বড়ো বাঁধাকপির পাতা দিয়ে তৈরি করা গদিতে বসিয়ে রাখে। মানিয়া যে ছোটো। সে এখনও তো গাছে চড়তেই শেখেনি।

মানিয়া জন্মেছে পরাধীন পোল্যান্ডে। তার জন্মের বহু আগে (১৭৯৫ সালে) পোল্যান্ড দেশটি তিন টুকরো হয়ে গেছে। সেগুলির ওপর খবরদারি করে তিনটি পৃথক দেশ। জার্মানি, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া। মানিয়াদের দেশ রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যান্ড। মানিয়ার জন্মের ছত্রিশ বছর আগে পোল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী মানুষ, রাশিয়ার সর্বময়-কর্তা জারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। শেষ রক্ষা হয়নি। জার নিকোলাস, বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকদের শাস্তি দিয়েছিলেন নির্বাসনে পাঠিয়ে। আর মানিয়ার জন্মের চার বছর আগে ১৮৬৩ সালে, পোল্যান্ডের বিদ্রোহী মানুষরা কুড়ুল, দা, শড়কির মতো অকিঞ্চিৎকর অস্ত্র নিয়ে জারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সেবারেও তারা হেরে গেল, আর জারের শাসন হয়ে উঠল আরও নিষ্ঠুর। বিদ্রোহীরা সাজা পেল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে বা মৃত্যুদণ্ডে। কেউ কেউ পালিয়ে গেল প্যারিসে। সারা দেশ ভরে গেল জারের গুপ্তচরে। পোল্যান্ডের মানুষ হারাল তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার অধিকার। একটা জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে ফেলার পক্ষে সেটাই ছিল যথেষ্ট। ক্রমশ, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী পোল্যান্ডবাসীরা অনুভব করলেন কুড়ুল-কাস্তে দিয়ে বিপ্লব মোটেই সবসময়ে কাজের হয় না। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ধাঁচটাই পালটানো দরকার। আপাত দৃষ্টিতে তাঁরা তখন জারের আনুগত্য স্বীকার করেনিলেন, কিন্তু তলে তলে দেশের নবীনদের মধ্যে স্বদেশের

ভাষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানচর্চার মতো দুরূহ কাজটি ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। দেশপ্রেমের বীজ নবীনদের মনে এভাবেই পোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। কাজটা অবশ্য খুব সহজ ছিল না। সারা দেশ-ভরতি জারের গুপ্তচরেরা স্কুলে স্কুলে হানা দেয়, খোঁজ নেয়, স্কুলের ছাত্ররা রুশ ভাষা না পড়ে পোল-ভাষা পড়ছে কি না। এ-ব্যাপারে ঘর-শত্রু বিভীষণ পোল্যান্ডবাসী গুপ্তচরদের ভূমিকা বড়ো কম ছিল না। মানিয়ার বাবার স্কুলের অধ্যক্ষ আইভানভ্ নামের লোকটি ছিল এই ধরনের। ছোটো থেকেই মানিয়া পুলিশ, জার, সাইবেরিয়া, নির্বাসন, এসব শব্দগুলো শুনে আসছে। এ সবের ঠিকঠাক মানে না বুঝলেও শব্দগুলোর মধ্যে কেমন যেন ভয়ের গন্ধ পায় সে। তবে এ ভয় সাময়িক। বাদামি রঙের দাড়িতে ঘেরা বাবার স্নেহময়- হাসিমুখ দেখে, মায়ের পরিশ্রমী-হাতে তৈরি করা জুতো পরার আনন্দে মশগুল হয়ে শিশু মানিয়ার মনে ওসব ভয়-ভয় শব্দগুলো বেশিক্ষণ আর হানা দেয় না। তাছাড়া, বাড়ির ভেতর কত আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে। লম্বা টানা ডেস্কে দাদা-দিদিরা পড়াশুনো করে। বড়ো হয়ে মানিয়াও ওখানে পড়বে। বাবার ডেস্কের ওপর বড়ো ঘড়িটা, দেয়ালে আটকানো থার্মোমিটারটা, বইভরতি কাচের আলমারিটা —সবই মানিয়ার খুব পছন্দের। তবে সবচেয়ে বেশি পছন্দের কাচের আলমারিতে রাখা নানা রকমের যন্ত্রপাতিগুলো। তার অধ্যাপক বাবা একসময় এগুলি দেখিয়ে ছাত্রদের বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতেন। জারের কঠোর শাসনে, প্রকাশ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ওগুলোর ওপর বাবার ভারী মমতা। আলমারির ওপরের তাকে রাখা যন্ত্রগুলোতে মানিয়ার দৃষ্টি নাগাল পায় না। তাই পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বারে বারে সেগুলোকে দেখতে ইচ্ছে করে। বাবা বলেন, ওগুলো 'ফিজিক্সের যন্ত্রপাতি'। অচেনা নামটা মানিয়া গানের সুরে মনে রাখার চেষ্টা করে। ভবিষ্যতের নোবেল-জয়ী বিজ্ঞানীর শিশু মনে ও নামটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে যায়।